ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1159-1165
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.117

পাঁচের দশকে বাংলা ছোটগল্পে নতুন ধারার আভাস

ড. সুমিতা চক্রবর্তী, *অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
জিতব্রতা গুহ, *গবেষক, সিকম স্কিল ইউনিভার্সিটি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 28.05.2025; Accepted: 30.05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

The primary characteristic of fiction is to reflect social reality and to portray the relationship between individuals and society. The decade of the fifties—i.e., the period from 1950 to 1959—was marked by extreme complexity and turbulence in Bengal's social, political, and economic spheres. In post-independence Bengali short stories, the central theme became the precariousness of middle-class life. The subject matter of those stories and the perspectives of their authors were entirely grounded in realism. However, literary trends and the thoughts of writers do not always proceed in a uniform manner. From the mid-fifties onward, some of these writers began attempting to reflect reality in literature from a different point of view. These stories arose out of social reality, but they seemed to form a circle of light and shadow around the most subtle layers—social, political, and psychological. Until then, realism in short stories was present in the atmosphere, subject matter, and crises of the narrative—this realism was a blend of beauty and ugliness, the terrifying and the tender. But from the 1950s onward, some writers began to view reality through the lens of reflection—this reality appeared as an unanswerable question. In the traditional vision of realism, there emerged unconventional projections and new techniques. A new trend thus emerged in the Bengali short stories of the 1950s. Until then, stories used to be centered on plot, with a definite conclusion; Bimal Kar introduced in place of this a more inward-facing sensibility. As a result, his stories did not follow a plot-centric approach, but neither were they entirely devoid of narrative—standing somewhere between the two, he experimented with new forms of storytelling. In 1959, he published a series of booklets under the title Short Story: A New Style. This was somewhat distinct from the conventional norms and methods of accepted short story writing. Even though some of Bimal Kar's stories adhered to traditional or conventional forms, in some of his works, this new perspective on realism can be discerned—for example, in the story Sudhamoy. This new trend of storytelling is discussed here with reference to the stories of four writers: Kamalkumar Majumdar, Dipendranath Bandyopadhyay, Debesh Roy and Sandipan Chattopadhyay.

Keywords: Short story, Realism conventional forms, social reality, Traditional literature, Short Story: A New Style, unanswerable question

সাহিত্য, বিশেষ করে কথাসাহিত্য সবসময়ই সমকালীন সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। কথাসাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হল সমাজ-বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করা এবং সমাজের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তাকে তুলে ধরা। পাঁচের দশক অর্থাৎ ১৯৫০ থেকে ১৯৫৯ এই সময় বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত জটিল ও আবর্ত-সংকুল। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দশকে বাংলা ছোটগল্পে প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল মধ্যবিত্তের জীবন যাপনের বিপন্নতা। সেই গল্পগুলির বিষয়বস্তু এবং লেখকের দৃষ্টিকোণ ছিল সম্পূর্ণ বাস্তব। কিন্তু সাহিত্যের ধারা, সাহিত্যিকদের চিন্তাভাবনা সব সময় একই ভাবে চলে না।

পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই লেখকদের মধ্যে কয়েকজন ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যে বাস্তবকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করলেন। এই গল্পগুলি সমাজ বাস্তবতা থেকে উঠে এসেছে, কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর গুলিকে ঘিরে যেন রচনা করেছে আলো-অন্ধকারের এক বৃত্ত। এতদিন ছোটগল্পে বাস্তবতা ছিল গল্পের আবহে, বিষয়বস্তুতে, সমস্যা-সংকটে, সেই বাস্তবতা সুন্দর-অসুন্দর, ভীষণ-কোমলের মিশ্রণ। কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকে কোনো কোনো লেখক বাস্তবতাকে দেখলেন মননের দৃষ্টিতে-এই বাস্তবতা যেন এক উত্তরবিহীন জিজ্ঞাসা। চিরাচরিত বাস্তব দর্শনে দেখা দিল অচিরাচরিত অভিক্ষেপণ এবং নতুন প্রকরণ। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকে ‘দেশ’, ‘পরিচয়’, ‘নতুন সাহিত্য’, ‘সাহিত্যপত্র’ ইত্যাদি একাধিক পত্রিকায় নতুন ধারায় গল্প লেখা হল, যা পাঠকদের আকৃষ্ট করে তুলল। বাংলা গল্পে এল নতুন ধারা।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে যে নতুন ধারার ছোটগল্প দেখা দিতে লাগল, তার সামগ্রিক মতাদর্শের বিশ্লেষণ দেখা যায়, সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত লেখক বিমল করের সম্পাদিত ‘ছোটগল্প: নতুনরীতি’ গ্রন্থমালায়। তিনি নতুন নতুন বিষয়, রীতি, ভাব-ভঙ্গিমা নিয়ে যেমন অনুসন্ধান করতেন তেমনই উৎসাহিত করতেন তরুণ লেখকদের। তিনি চল্লিশের দশকে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অনাহার অরাজকতা, রাজনীতির পালাবদল, সাম্প্রদায়িক শক্তির ভয়ংকর তাণ্ডব এবং এরই পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে সাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য সাহিত্যকীর্তি। তাঁরা নিজস্ব ধরনের মধ্যেই বাস্তবের নির্মম কঠোরতাকে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু ছোটগল্পের রূপরীতির দিক থেকে তাঁদের লেখায় ছিল বাস্তব জীবনের স্বাভাবিক চিত্র। এখান থেকেই পৃথক হয়ে গেল নতুনরীতির গল্প-ধারার বৈশিষ্ট্য।

এতদিন গল্পে যে কাহিনি সর্বস্ব নির্দিষ্ট পরিণতি ছিল, বিমল কর তার পরিবর্তে নিয়ে এলেন এক অন্তর্মুখী বোধ। ফলে তাঁর গল্পে কাহিনি সর্বস্ব ব্যাপারটা যেমন এল না, তেমনই পুরোপুরি গল্পহীনতাও থাকল না-এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় দাঁড়িয়ে তিনি গল্পকে নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ‘ছোটগল্প: নতুনরীতি‘ নাম দিয়ে একটি পুস্তকমালা প্রকাশ করেন। যা ছিল তথাকথিত নিয়মসিদ্ধ ছোটগল্পের নীতি-পদ্ধতি থেকে কিছুটা পৃথক। নতুনরীতির গল্প প্রসঙ্গে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন:

> “ধারা-বদলের কিংবা নতুন একটা রীতি প্রবর্তনের তীব্র ইচ্ছাতেই যে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা নয়। বরং এর মধ্যে আত্ম আবিষ্কারের একটা প্রচেষ্টা ছিল।... তাঁরা পুরোনোরীতি, প্রকরণ, বিন্যাস এবং বিষয় ত্যাগ করতে চাইছিলেন - বহির্মুখীনতার চেয়ে তাঁদের কাছে স্বাদুতর ছিল নিজেদের অন্তর। তাই তাঁদের লেখায় স্ব-কৃত আত্ম প্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটেছিল বারংবার, পাওয়া যাচ্ছিল সমাজ এবং বাস্তবের খন্ডিত দৃশ্যাবলী। মানুষের ভিতরের অতি জটিল সূত্রে অন্তর এবং বাহির গ্রথিত হয় - স্বপ্নে এবং চিন্তায় তার অদ্ভুত প্রকাশ ঘটে।”[১]

বিমল কর এই নতুন রীতির প্রবক্তা হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের লেখা ছোটগল্প সম্পূর্ণভাবে এই রীতির অনুসারী নয়। তিনি এই নতুন রীতিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ও পাঠকের সামনে এই রীতিকে তুলে ধরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শচিন দাশ লিখেছেন:

> “গল্পের গদ্যরীতি, তার শৈলী বা ফর্ম এবং আঁকশি বাড়িয়ে ভিতরের অন্তর্নিহিত বিষয়কে নতুন তাৎপর্যে ব্যঞ্জনাময় করে তোলায় তিনি সবসময়ই গল্পকে নানা ভাবে ভেবেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও নেমেছেন।”[২]

বিমল করের নিজের লেখা গল্পে প্রথাসিদ্ধ বা পরম্পরা সিদ্ধরীতির অনুবর্তন দেখা গেলেও, তাঁর লেখা কোনো কোনো গল্পে এই নব্য বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ ধরা পরেছে। যেমন: ‘সুধাময়’ গল্পটি। সুধাময় নামের এক ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতা বোধের গল্প ‘সুধাময়’। এছাড়ও বিমল করের ‘জননী’, ‘সোপান’, ‘অপেক্ষা’ গল্পগুলি প্রচলিত ধারা থেকে একটু আলাদা। অন্তরের গভীর অনুভূতির জটিল রহস্যই গল্পগুলির মূল বিষয়, যা ছোটগল্পের ধারা বদলের ইঙ্গিত দেয়।

এই নতুন গল্প ধারার চারজন লেখক কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯), দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০৫)-এর গল্প নিয়ে আলোচনা করা হল।

কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯) বাংলা কথাসাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী লেখক। পাঁচের দশকের শুরু থেকেই একাধিক পত্রিকায় নতুন ধারায় গল্প লেখা শুরু হলেও ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'সাহিত্য পত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদারের 'জল' গল্পটিকে এই ধারার প্রথম গল্প বলা যেতে পারে।

কমলকুমার মজুমদারের 'মল্লিকা বাহার' (১৯৫১) গল্পটি বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গল্প। নারী-পুরুষের বিচিত্র প্রেম, অসম বয়স্ক প্রেম, নারীর শারীরিক মানসিক টানাপোড়েন এবং এইসব কিছুকেই ছাড়িয়ে সমলিঙ্গ-এর প্রতি আকর্ষণ ও প্রেমের বিচিত্র রূপকে তুলে ধরা হয়েছে এই গল্পে। এই গল্পের নায়িকা মল্লিকা। সে প্রেম চেয়েছিল কিন্তু কোনো পুরুষই তাকে সেই প্রেম দিতে পারেনি। মল্লিকা নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ। সে কোনো পুরুষের মধ্যে নয়, 'পুরুষালী দীপ্তি' খুঁজে পেয়েছে তার পরিচিত শোভনাদির মধ্যে:

> "শোভনার এ ব্যবহার বড় আপন বলে মনে হয়, বহুদিনের শোভনাদি। না তা কেন বহু যুগের শোভনাদি, গায়ের রঙ যার হালি মুগের মতই।... গায়ে তার ব্লাউজ নেই - শাড়িটা হাওয়া হাওয়া, মল্লিকা তা নজর করলে।"[৩]

শোভনা সোহাগ করে মালা পরিয়ে দিল, আর চুম্বনে চুম্বনে ভুলিয়ে দিল মল্লিকার না পাওয়া প্রেমের শোক।

এই দুঃসাহসিক সংলাপে বাঙালি পাঠক চমকে উঠলেন। সমাজের বেঁধে দেওয়া রাস্তায় মানুষের মন চলতে পারে না। বিষম লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক, তেমনই সমলিঙ্গের প্রতিও মানুষ আকৃষ্ট হতে পারে। সেই সময় দাঁড়িয়ে কমলকুমার মজুমদার এই কথাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এখন সমস্ত বিশ্বে হোমো সেক্সচুয়ালিটি এবং লেসবিয়ানিজম খুবই প্রাসঙ্গিক ও স্বাভাবিক। কমলকুমার মজুমদার বহু বছর আগে এই নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে গেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথাসিদ্ধ স্রোতের দিকে না হেঁটে, বিপরীত দিকে হেঁটেছেন। কমলকুমারের গল্পে শরীর-চেতনা থাকলেও তা শৈল্পিকভাবে সার্থকতা লাভ করেছে। আর এখানেই কমলকুমার মজুমদারের স্বকীয়তা। সেইজন্যই এটি নতুন ধারার গল্প হয়ে উঠেছে।

'মতিলাল পাদরী'(১৯৫৭-৫৮) গল্পটি শুরু হয়েছে গির্জার ভৌগোলিক অবস্থানকে চিহ্নিত করে। এই গির্জায় থাকেন বাঙালি ক্রিশ্চান পাদরি মতিলাল। তিনি প্রতিদিন সকালে গ্রামের দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা করেন তাঁর একটিমাত্র প্রত্যাশা— পূর্ণাঙ্গ ক্রিশ্চান হওয়া। এক আষাঢ় মাসে এক ঝড়-বৃষ্টির প্রেক্ষাপটে মতিলাল পাদরি শুনতে পেলেন 'অস্থির গোঙানির আওয়াজ'। নবজাতককে পৃথিবীতে আনার জন্য এক রমণীর গোঙানি। এই গির্জার ঘরে তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায়ের নারী ভামর সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এই সন্তানকে দেবদূত রূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি পাদরী মতিলাল। এই ভাবেই মতিলাল পাদরীর যাপিত জীবনে এসে পরে ভামরের সন্তান।

ভামরের ব্যভিচারী জীবন-যাপন দেখে মতিলাল ক্ষুব্ধ হন, তখন শিশুটির পবিত্রতাও ম্লান হয়ে যায়। সেই মুহূর্তেই পাদরি প্রকৃত খ্রিস্টানের মনোভাব থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। পাপীকে তিনি ক্ষমা করতে পারেননি। তাই তিনি ঘন-জঙ্গলে শিশুটিকে রেখে আসার জন্য গেলেন:

> "এই চত্বরটি আরও পরিচ্ছন্ন। আঁঠরালতা উঠে গেছে শালগাছে, নিম্নে গুলঞ্চ আর চারিদিকে দোনার ঝোপ। শিশুপুত্রকে কাঁধ থেকে নামিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পাদরী দাঁড়লেন। আঙুল মটকাতে গিয়ে কি যেন মনে হল, সেখানে যেন প্রার্থনার কথা ছিল, আঙুল মটকে প্রার্থনাকে ভেঙে দিলেন, তুই-তোকারির সাদামাটা জগৎ থেকে সে প্রার্থনা অনেক দূরে সরে গিয়েছিল।"[৪]

সমগ্র গল্পে এই অংশটি পাঠকের চিত্তকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে রাখে। শিশুটিকে কোলে নিয়ে অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সময়ে পাদ্রির অন্তরের আত্মযন্ত্রণা কোনো ঘটনার মধ্যে দিয়ে নয়, লেখকের ভাষার সূক্ষ্মতায় মূর্ত হয়ে ওঠে। তারপর শিশুটিকে দেখে আসার মুহূর্তে শিশুটির ক্রন্দনরত 'বাব্বা' ডাকে মতিলাল পাদরির মানবিকতা জেগে ওঠে। শিশুপুত্রকে আবার আগের মতো আলিঙ্গন করলেন। মতিলাল পাদরীর হৃদয়ে অন্তর্নিহিত মানবধর্ম জাগ্রত হল- তিনি প্রকৃত খ্রিস্টান হয়ে উঠলেন।

'মতিলাল পাদরী' গল্পটিতে সামাজিক পরিবর্তনের বাস্তবতা ভেদ করে জেগে উঠেছে একটি মানুষের মনের গভীরতা ও সংকট। গল্প শেষে পাঠকের মনের মধ্যে ধরে রাখেন মতিলাল পাদরীর হৃদয়ের ব্যাকুলতাটুকু। এখানেই এই গল্পে নতুনরীতির লক্ষণ ধরা পড়েছে। সমগ্র গল্পটিতে ভাবাবেগের একটি স্তরের পর আর একটি স্তর পর পর আসতে থাকে। অরণ্যের নির্জনতা, পাদরীর ধর্মভাবনা, গ্রামের মানুষের প্রতি তাঁর স্নেহময় আচরণ, ভামরের নবজাতককে দেখে তাঁর গভীর তৃপ্তি, ভামরের ব্যভিচার আবিষ্কারে তার বেদনার্দ্য ক্রোধের অনুভব এবং সবশেষে মানসিক যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে খ্রিস্ট ধর্মের অন্তর সত্যকে স্পর্শ করা— এই স্তরান্বিত উপলব্ধির গঠন শৈলীতেই এই গল্প হয়ে উঠেছে ভিন্ন ধরনের বাস্তবতার ভাষারূপ।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচের দশক থেকেই বিশিষ্ট তরুণ গল্পকার রূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর রচিত গল্পে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নির্ধারিত ছক অনুসৃত হয়নি। সাহিত্যিক বিমল কর সম্পাদিত "ছোটগল্প নতুনরীতি" গল্পমালায় স্থান পেয়েছিল তাঁর লেখা 'জটায়ু' (১৯৬০) গল্পটি।

'জটায়ু' গল্পের শুরুতেই জানা যায়, নিত্যচরণের হাত ট্রেনের নিচে কাটা যাওয়ায় তার স্ত্রী দুর্গাকে শহরের হোটেলে কাজ নিতে হয়। আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও তাদের সংসারে অবিশ্বাস, অশান্তি ছিল না। কিন্তু বর্তমানে তাদের সংসারে অবিশ্বাস সন্দেহ দানা বাঁধে। দেশভাগ ও দাঙ্গার ফলে মানুষের জীবনে যে অভিশাপ, দারিদ্র, আশ্রয়হীনতা দেখা দিয়েছিল; তারই ফলে দুর্গা ও নিত্যচরণের জীবনেও এসেছে অর্থনৈতিক সংকট- যা থেকেই পরস্পরের প্রতি এসেছে সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভয়, পাপবোধ, আড়ল করার ইচ্ছা।

অমাবস্যার রাতে কালী পূজায় নিত্যচরণ আগুনের বেড়জালের উপরে নাচবে, নিত্যচরণের এই নাচের ধাপে ধাপে দুর্গার অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে যায় দেশেভাগ ও দাঙ্গার ছবি— তার কথকতা করা বাকশিল্পী বাবার চুলে, দাঁড়িতে আগুন লাগলেও পুরাণের কোনো বীর এসে বাবাকে বাঁচায়নি। দুর্গা ও তার মা কে একসাথে জ্বলন্ত বাড়ির সামনে ধর্ষণ করেছিল। এপারে এসে নিত্যচরণের সঙ্গে দুর্গা কলোনিতে সংসার পাতে। নিত্যচরণের অক্ষমতার জন্যই সে হোটেলে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। দুর্গার মনে পড়ে, নিত্যচরণের দুর্ঘটনার দৃশ্য, হোটেলের কেবিনের অপমানের দৃশ্য। বাঁচা আর না বাঁচার দোলাচলতার আত্মহননের মধ্যেও দুর্গার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা।

গল্পে নিত্যচরণের নাচের অনুষঙ্গে দুর্গার জীবনের এক একটি পর্ব উঠে এসেছে। নিত্যচরণে নাচ প্রতীকী হয়ে ওঠে। রামায়ণে রাবণের হাত থেকে সীতাকে উদ্ধারের জন্য জটায়ু প্রাণ দিয়েছিল। রাবণের অস্ত্রের আঘাতে জটায়ুর ডানা কেটে গেলেও আমৃত্যু সে সীতাকে উদ্ধারের জন্য লড়ই করেছে। কালীমূর্তির সামনে নিত্যচরণের দুহাত কাটা শরীরটার উদ্যম নাচ দেখে মনে হয়, এই গল্পের দুর্গাকে অশুভ শক্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ডানাহীন নিত্যচরণের আগুনের প্রলয় নৃত্য। নিজে আগুন হয়ে চারিদিক পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে উদ্যত। আগুনে পুড়ে তার মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসবে সংগ্রামী দুর্গা ও নিত্যচরণ। সুস্থ ও শুভ পৃথিবীর জন্য মানুষের সংগ্রামী চেতনা জাগ্রত করার এক ইঙ্গিত। রামায়ণের জটায়ু আসলে বিশ শতকের চেতনা সংগ্রামী মানুষ। কালীমূর্তির ভয়ঙ্করতার কাছে যেখানে অন্যায়, পাপ, নতজানু হয়ে যায় সেখানে নিত্যচরণ স্পর্ধায় মাথা তুলেছে। কারণ তার সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাই পুরাণের আবহে 'জটায়ু' গল্পটি বিশ শতকের সংগ্রামী মানুষের নব্য পুরাণ হয়ে উঠেছে।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চর্যাপদের হরিণী' গল্পটি প্রকাশিত হয়। বিষয়-ভাবনা, ভাষা, গল্পটির পরিকাঠামো বাংলা ছোটগল্পের ধারায় অভিনব সংযোজন। গল্পের নায়ক সুধাময় ইনসমনিয়া ডিসপেপসিয়াগ্রস্থ বেকার, স্লিপ ওয়াকার, এক একত্রিশ বছরের যুবক। যুবকটির চিন্তাভাবনা--- ভ্যান গগ, লেনিন, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধ, যিশু খ্রিস্ট, বিদ্যাসাগর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়র দ্বারা প্রভাবিত। তার আত্মকথনই গল্পটির শৈলী। সুধাময়ের রাতে ঘুম নেই। সে তখন নিজেকে চেনার চেষ্টা করে। তার মনে হয় রাতের অন্ধকারে কোটি কোটি ঘুমন্ত আত্মার মধ্যে সেই একমাত্র জীবন্ত আত্মা। সমস্ত পৃথিবীটাকে তার সুধাহীন মনে হয়। সে নিজের অস্তিত্বকেও চিনতে পারে না। তাই সে কখনও হয় তেত্রিশ বছরের আবার কখনও তেইশ বছরের যুবক। সে সময় কাটানোর জন্য আদালতে যায়। সে দেখে আদালতে কত ব্যভিচার, কত পাপ প্রকাশ্যে হয়ে চলছে। আবার সে নিজের কথা চিন্তা করে আত্মশান্তি পায়। সুধাময় চিন্তাশীল থাকলেও তার চিন্তা-ভাবনার অসংলগ্নতা তাকে স্নায়বিকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সুধাময় জীবন, সমাজ সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তার মনের কমপ্লেক্স আসলে সমাজ

বাস্তবতা। চর্যাপদের হরিণ-হরিণীর সম্পর্কে তার নতুন ব্যাখ্যায় ধরা পড়ে সে কতটা জীবন ও ভালবাসার প্রতি আস্থাশীল:

> "হরিণ-হরিণী হইল যথাক্রমে Symbol of life ও love। শূন্যতাবাদ আসলে শূন্যতাহীনতা, পরিপূর্ণতা। নৈরাত্মা দেবী হল মানবী। শবর বা হরিণ সেই eternal man।"[৫]

প্রচলিত আঙ্গিকের নিয়মনীতিকে ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'চর্যাপদের হরিণী' গল্পটি লিখেছেন। বিষয়- ভাবনা, চরিত্র, ভাষা সমস্ত দিক থেকেই গল্পটি স্বতন্ত্র। প্রাচীন বাংলার চর্যাপদে হরিণীর ইমেজকে দীপেন্দ্রনাথ খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চারিদিকের আশ্রয়হীনতার মধ্যে নতুন পথের সন্ধানে চর্যাপদের হরিণের মতো হরিণীর সন্ধানে ক্ষিপ্রবেগে ছুটে চলেছে মানবাত্মা। সুধাময়ের ভাবনায় তাই হরিণ হরিণী এসেছে জীবনের শুদ্ধতা খুঁজতে। লেখক আশাবাদী, তাই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও দুঃসহ কলকাতার জীবন ভালোবাসার প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। 'চর্যাপদের হরিণী' আসলে জীবন অন্বেষার প্রতীক হয়ে ওঠে।

পঞ্চাশের দশকে বাংলা সাহিত্যে যে নতুন গল্প-ভাবনা শুরু হয়েছিল সেই ধারার অন্যতম ছোটগল্প দেবেশ রায়ের 'হাড়কাটা'(১৯৫৫)। এক মিউনিসিপাল মার্কেটে লাইসেন্স প্রাপ্ত কসাই নানকু কাহার। নানকুর দোকানের সামনে মাংস-লোভী ক্রেতা, পাগল, কুকুরের সর্বদা হট্টগোল। সর্বোপরি আছে নানকুর অর্থাভাব। তাই সারাদিন কাজ করে বাড়ি গেলেও শান্তি নেই। তার বউ গাধুলি। সে নানকুর কাছে রুপোর হাঁসুলি কিনে দেওয়ার দাবি করলে নানকু ক্রুদ্ধ হয়ে গাধুলিকে ধাক্কা দেয়। এরপর আসে নানকুর অনুতাপের পালা। তাই নানকু বাড়িতেও বউ গাধুলির জন্য কিছুটা মাংস নিয়ে আসে। বাস্তব জীবনের হতাশা দারিদ্র এবং এই দারিদ্রর সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম নানকুকে পাষাণ খন্ডে পরিণত করেছিল। কিন্তু তার মনের অবচেতনে থাকা জীবন-তৃষ্ণা মানুষের স্বাভাবিক মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলেছে।

পঞ্চাশের দশকে বাঙালি মধ্যবিত্তকে নতুনভাবে জীবনের ভাবনা ভাবতে হয়েছিল। তারই প্রতিফলন দেবেশ রায়ের 'হাড়কাটা' গল্পের নায়ক মিউনিসিপাল মার্কেটের লাইসেন্স প্রাপ্ত কসাই নানকু কাহারের চরিত্রে। এই জীবিকার সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত আগে পরিচিত ছিল না। নানকু কাহার একই সঙ্গে নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি, আবার অনেক নানকু কাহারের প্রতিনিধি। লেখক এখানে একটি মানুষের স্থানের বা সময়ের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। একজন মানুষ তার দেশ-কাল চারপাশের পরিবেশ বৃত্ত নিয়েই একটা আস্ত মানুষ হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে এর আগে মাংস ব্যবসায়ী কসাইয়ের চরিত্র এলেও, সেখানে অস্তিত্বের বাস্তবতা ছিল না, সেই বাস্তবতাকেই লেখক তুলে ধরেছেন। এই বাস্তবতা এক নতুন ধরনের। এই বাস্তবতার বিভিন্ন রং ও নমনীয়তা বাস্তবতার নির্যাস যা জীবনকে নতুনভাবে নির্মাণ করে, এই বাস্তবতা এক অচেনা অভিজ্ঞতার সমবায় গঠিত। দেবেশ রায় এই বাস্তবতা সম্পর্কে লিখেছেন:

> "বাস্তব যেন বহু বিচিত্র আকারে এক প্রান্তর - সেখানে নিজের ছায়া নিজে মাড়নো যায় না। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সেই আয়াসে বস্তুকে বস্তুর আকারে চিনে নেওয়ার সেই চেষ্টায় কত নতুন প্রকরণ খুঁজে বেড়তে তখন ইচ্ছে গেছে।"[৬]

দেবেশ রায়ের এই ধারার গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম 'দুপুর' ('দেশ' ১৯৫৮) জৈষ্ঠ মাসে একটি পরিবারের পাঁচটি মানুষের দুপুর যাপনের গল্প। মধ্যবয়স্ক স্বামী ও স্ত্রী এবং তাদের তিন ছেলে মেয়ে কিভাবে দুপুরবেলা কাটাচ্ছে তার চিত্র এবং সেই চিত্রকল্পকে আশ্রয় করে লেখক পৌঁছে যান এই পাঁচটি অসমবয়সী চরিত্রের মনোজগতে। কোনো ঘটনা নেই, কোনো পরিণাম নেই, শুধু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়া ছাড় অর্থাৎ তথাকথিত গল্প বলতে যা বুঝি এই গল্পে তা অনুপস্থিত। পাঁচটি ভিন্ন ও বিচিত্র মনের ভাবনা টুকরো টুকরো ভাবে যেন আকার পেয়েছে। শরীর-মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার সংমিশ্রণে পাঁচজনের কাছে দুপুর আলাদা আলাদা ভাবে ধরা পড়েছে।

'দুপুর' গল্পটিতে পরিবারের পাঁচজনের ভাবনা বিচ্ছিন্ন হলেও তা মিলে যায় একটি বেহালার সুরের সঙ্গে। মাটির বেহালার সুর আস্তে আস্তে দূরে চলে যায়। এইভাবে দুপুরও ধীরে ধীরে বিকেল হয়ে যায়। দুপুর প্রাকৃতিক, সুর মানবিক— এই দুইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আমাদের জীবন। তাদের প্রত্যেকের চরিত্রের সঙ্গে দুপুরের রং ও স্বাদ বদলে গেলেও বিকেলের অস্তরাগে তাদের সমন্বয় ঘটে। এই পাঁচটি চরিত্র যেন আলাদা হয়েও আলাদা নয়। পার্থিব মানুষের মনের বাসনাগুলি প্রত্যেকের পৃথক হলেও পৃথক নয়। 'দুপুর' গল্পে এমনই একটি সর্বজনীনতার আবহ

আছে। সেই আবহ সঞ্চারিত হয় ওই বেহালার সুরে। 'দুপুর' গল্পে এই সুরের ব্যঞ্জনা অসাধারণ এক কবিত্বময়তার সৃষ্টি করেছে।

পঞ্চাশের দশকে বাংলা সাহিত্যে যে ছোটগল্পে নতুনরীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল 'দুপুর' গল্পটি তার অন্যতম উদাহরণ। সমগ্র গল্পটি আলোকচিত্রের মত ভেসে উঠেছে। প্রতিটি বাক্য অনুভূতির জগৎ থেকে উঠে আসা ভাষারূপ, যেন সাবয়বতার রূপ নিয়েছে। এই ধরনের গল্প বাংলা সাহিত্যে খুবই বিরল। এই গল্পটি সম্পর্কে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন:

> "একটি স্মরণীয় গল্প 'দুপুর'। নির্দিষ্ট ঘটনা-সংবলিত কথাবৃত্ত বর্জন করবার পথে একজন গল্পকার কতদূর এগিয়ে যেতে পারেন তার অন্যতম দৃষ্টান্ত এই গল্প।"[৭]

নতুনরীতির যে ছোটগল্পের ধারা পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাঙালি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেই ধারায় যে অল্প কয়েকজন লেখকের নাম করা যায় তাঁদের অন্যতম অবশ্যই সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৩-২০০৫) প্রথম সাড়া জাগানো ছোটগল্প 'বিজনের রক্তমাংস' (১৯৫৯)। এটি বিমল করের "ছোটগল্প: নতুনরীতি" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় । এই গল্পের নায়ক বিজন। বিজনের শারীরিক অসুস্থতা তাকে স্বাভাবিক জীবন থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। গল্পের শুরু জৈবিক বিষয় দিয়ে এবং শেষ এক্স-রে প্লেট দিয়ে। রক্তমাংসের স্বাভাবিক মানুষ বিজন ধীরে ধীরে অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রবেশ করে।

এক বিপন্নতাবোধ সমগ্র কাহিনি জুড়ে। এখানে সেই অর্থে কোনো গল্প নেই। পুরোটাই বিজনের একটি দিনের কার্যকলাপ এবং তার সঙ্গে তার মানসিক চিন্তাচেতনা। কিন্তু লেখক একটির পর একটি যে ছবি গল্পে এঁকেছেন তা পাঠককে স্পর্শ করে। এটাই সময়ের, পৃথিবীর ব্যাধি, সমগ্র মানুষের ব্যাধি। এর থেকে যেকোনো সময় মুক্তি আসতে পারে এই আশায় মানুষ বাঁচে। এক নতুন শিল্পরূপের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির অবসাদ, ব্যাধির আতঙ্ক ইত্যাদি অতিক্রম করে তা সভ্যতার অসুখকে যেন নির্দেশ করে।

'কৃত্তিবাস' পত্রিকার গল্প সংখ্যায় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী'। বিষয়বস্তুর জন্য নয়, কেন্দ্রীয় উপলব্ধির জন্যও নয়, গল্পের রচনাশৈলীর অভিনবত্বের জন্য এই গল্পটি বাংলা সাহিত্যে নতুনরীতির গল্প হিসেবে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। গল্পের কথক উত্তম পুরুষের 'আমি' একটি চরিত্র। কিন্তু তারও নাম বিজন। অপর চরিত্র মায়া। দুজনেই পরিণত যুবক-যুবতী। পরিচয় খুবই সামান্য। কথকের চোখ দিয়েই মায়াকে এবং সমগ্র পরিবেশকে দেখানো হয়েছে।

গল্পটির নামকরণের মধ্যেও রয়েছে অর্থবহ ইঙ্গিত। ক্রীতদাস ক্রীতদাসী কারা? বলাই বাহুল্য কথক সেই ক্রীতদাস আর মায়া ক্রীতদাসী। আধুনিক সভ্যতার স্বপ্নহীন, আশাহীন, মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে বধ্য সকল নারী ও পুরুষ তাদের জীবনের কাছে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী।

পাঁচের দশকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা-ছোটগল্পে নতুনরীতির ধারা এক বিশেষ ঘটনা। স্বাভাবিক সমাজ বাস্তবতাকে এখানে তুচ্ছ না করে, অন্তগূঢ় এবং মনস্তত্ত্বের বিচিত্র কাটাকুটিতে এক আশ্চর্য নির্মাণ। সেইসঙ্গে দুটি বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের পর মানব সভ্যতা বিপন্নতার স্বরূপ এই নতুনরীতির গল্পের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু বেঁচে থাকার প্রাণশক্তিও তুচ্ছ হয়ে যায়নি। এইসব লেখাতেই ভেঙে গেল ঘটনা-নির্ভর, প্লট-প্রধান ছোটগল্পের ধারণা। বাংলা গল্পে উঠে এল মানব মনের জটিলতা আর মানব জীবনের যন্ত্রণাকৃর্ণ বিষাদ। এখান থেকেই বাংলা-ছোটগল্প আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, 'মায়াবী নিষাদ', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৬

২. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার সম্পাদিত, উর্মি রায়চৌধুরী, শচীন দাশ: 'বিমল কর: সময় অসময়ের উপাখ্যানমালা'; শচীন দাশ: 'বিমল কর: 'ছোটগল্প: নতুনরীতি'; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; কলকাতা-৯, পৃ: ১২৪

৩. মজুমদার, কমলকুমার, ‘মল্লিকা বাহার’; ‘গল্প সমগ্র: কমলকুমার’ সম্পাদনা: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ, ১৯৯০, কলকাতা, পৃ: ৬৪
৪. মজুমদার, কমলকুমার, ‘মতিলাল পাদরী’; ‘গল্পসমগ্র: কমলকুমার’ সম্পাদনা: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ, ১৯৯০, কলকাতা, পৃ: ৮১
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ, ‘চর্যাপদের হরিণী’, গল্প সমগ্র; সম্পাদনা অনিশ্চয় চক্রবর্তী; একুশ শতক, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা, পৃ: ২৫১
৬. রায়, দেবেশ, ‘গল্প সমগ্র’ প্রথম খন্ড, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯২, পৃ: ৭
৭. চক্রবর্তী, সুমিতা, ‘ছোটগল্পের বিষয়ে আশয়’, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, জুন ২০০৪, পৃ: ৩২০